IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

।। মালতীমাধবের সামাজিক বৈচিত্র্য ।।

DR.SUBRATA KUMAR MANNA

SACT

Panskura Banamali College

কালিদাসোত্তর যুগের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে যাঁর নাম উচ্চারিত হয়, তিনি হলেন কাশ্যপ বংশজাত নীলকণ্ঠপুত্র ভবভূতি। সংস্কৃত সাহিত্যে নাট্যকার হিসেবে তাঁর পরিচিতি অসামান্য। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ ও অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগ ছিল তাঁর আবির্ভাব কাল। তাঁর রচিত রূপকত্রয়ের মধ্যে মালতীমাধব প্রথম রচনা বলে বিবেচিত হয়। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রীয় পরিভাষানুসারে মালতীমাধব একটি দশাংকবিশিষ্ট প্রকরণ তথা সামাজিক রূপক। সামাজিক বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করে রচিত বলে এই ধরণের রূপকে কবিকল্পনার স্বচ্ছন্দ প্রসারের ক্ষেত্র অবাধ।তাই এই রূপকে তৎকালীন সমাজচিত্র হিসেবে এর ঐতিহাসিক মূল্যও অসাধারণ।

মালতীমাধবের বৃত্তান্ত ভবভূতির স্বকল্পিত। তবে গুণাঢ্যের বৃহৎকথার কোন কোন কাহিনীর মধ্যে এই রূপকের গল্পাংশের একটি ক্ষীণ আভাস পরিলক্ষিত হয়। কাহিনীর গ্রন্থণা ও সার্বিক পরিকল্পনাতে ভবভূতির কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। মাত্রাহীনতা, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ, কথা সংক্ষেপের অভাব, ওজোদীপ্ত ভাষার প্রয়োগ প্রভৃতি ত্রুটি থাকা স্বত্বেও সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে মালতীমাধবের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তব চরিত্র অবলম্বনে দৃশ্যকাব্য রচনার ক্ষেত্রে মালতীমাধব অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের যোগ্য ।

পদ্মাবতী নগরের রাজমন্ত্রী ভূরিবসুর কন্যা মালতী এবং বিদর্ভরাজের অমাত্য দেবরাতের পুত্র মাধবের প্রণয়কাহিনী নিয়ে রচিত একটি সামাজিক রূপক হল মালতীমাধব। এখানে তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির চিত্র অংকিত হয়েছে। ভবভূতির সময়ে সমাজে বর্ণব্যবস্থা ও আশ্রমব্যবস্থার প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে মানুষের জীবন বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম - এই দুটি প্রথায় নিয়ন্ত্রিত ছিল । অপরদিকে সমাজস্থ মানুষের পরিচয় ও পারস্পরিক সম্বন্ধকে সুদৃঢ় করেছিল। সেকালের বর্ণব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ ,ক্ষত্রিয় ,বৈশ্য ও শূদ্রের পৃথক পৃথক জীবিকা নির্ধারিত ছিল। চতুর্বর্ণের স্বধর্ম ও ছিল পৃথক। ব্রাহ্মণের ধর্ম অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম ছিল - অধ্যয়ন ,অধ্যাপনা যজন যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ বা দানগ্রহণ। অনুরূপে ক্ষত্রিয়দের ধর্ম হল অধ্যয়ন ,যজন, দান শাস্ত্র দ্বারা জীবিকা নির্বাহ ও প্রাণীরক্ষণ ।বৈশ্যদের ধর্ম হল অধ্যয়ন ,যজন ,কৃষিকাজ ,পশুপালন ,বাণিজ্য ,কারুশিল্প। এছাড়া শূদ্রের ধর্ম হল - দ্বিজাতি সেবা, কৃষি পশুপালন ,বাণিজ্য ,কারুশিল্প , ত্রৈর্যত্রিক। এইভাবে প্রতি বর্ণের জন্য আচরণীয় ধর্ম সুনির্দিষ্ট সমাজকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা ছিল। এই চতুর্বর্ণের মধ্যে ভবভূতি মালতীমাধবে ব্রাহ্মণকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন । সমাজে বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের সমানভাবে দেখা হত। ভবভূতি ও তার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ জাতিভুক্ত। এরা ছিলেন কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার ব্রাহ্মণ

তারা কাশ্যপ গোত্রীয় ছিলেন। আর পূর্বপুরুষেরা ধার্মিক ব্রাম্ভণ ছিলেন। তারা ব্রত ও পঞ্চ পবিত্রাগ্নি রক্ষায় ব্যস্ত থাকতেন। আর শূদ্রবর্ণ সকল বর্ণ অপেক্ষা নীচস্থ। তারা ব্রাম্ভণাদির কর্মানুষ্ঠানের অধিকার কখনো অর্জন করেননি। তাই মহাভারতের শান্তিপর্বে আমরা পাই ----

ব্রম্ভনো মুখ্যতঃ সৃষ্টৌ ব্রাম্ভনো রাজসত্তম।

বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয: সৃষ্ট ঊরুভ্যাং বৈশ্য এব চ।।

বর্নানাং পরিচর্যারথং ত্রয়াণাং ভরতর্ষভঃ।

বর্ণশ্চতুর্থ: সংভূতঃপদভ্যাং শূদ্রো বিনির্মিতঃ।।(মহাভারত, শান্তি।৩২/৪ – ৫)

ব্রাহ্মণের পরেই ক্ষত্রিয়রা সমাজে স্বতন্ত্র ছিল। বৈদিক যুগ থেকেই ক্ষত্রিয়রা ছিল শাসক সম্প্রদায়। আর তৎকালীন সমাজে তৃতীয় স্থানে ছিল বৈশ্যরা । তারা ব্রাম্ভণ ও ক্ষত্রিয়ের চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল। তাদের সামাজিক মর্যাদা শূদ্রদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজতত্ত্বের ইতিহাসে চতুরাশ্রমের ভূমিকা অসামান্য। মূলতঃ আশ্রম ভাবনার উদ্দেশ্য মানবজীবন ও তার আচার আচরণ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ। 'আশ্রম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আ-শ্রম্ + ঘঞ্, যার অর্থ উদ্যম প্রকাশ করা। মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রায় চতুরাশ্রমের প্রথা রয়েছে।

ব্রহ্মচর্যঃ - এটি মূলতঃ শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত। সেকালের মানুষ সন্তানের নানা চিত্তোৎকর্ষের জন্য শিক্ষাব্যবস্থার কথা চিন্তা করতেন। আচার্যের কাছে গিয়ে শিশুশিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করতে পারবে- এটাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। ব্রহ্মচারীদের স্বধর্ম হল - স্বাধ্যায় বা নিজ নিজ বেদশাখার অধ্যয়ন। অগ্নির উপাসনা ,স্নান ও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন। আর যারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী , তাদের যাবত্ জীবন গুরুর নিকটে অবস্থান। গুরুর অভাবে গুরুপুত্রের নিকট অবস্থান করা।

গার্হস্থঃ- ব্রম্ভচর্যাশ্রম ত্যাগ করে স্নাতক যুবক বিবাহ কার্য সম্পন্ন করে গার্হস্থ জীবনে প্রবেশ করে। গৃহস্থের স্বধর্ম হল - নিজ নিজ বর্ণের জন্য ব্যবস্থিত কর্মের দ্বারা জীবন জীবিকা নির্বাহ করা , সবর্ণের অসগোত্রের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা। ঋতু রক্ষার জন্য পত্নী গমন করা ,অতিথি ও ভৃত্যদের খাদ্যাদি দান করার পর দান অবশিষ্ট খাদ্য ভোজন করা। মনুর মতে সর্বপ্রকার আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ।

বাণপ্রস্থ - গার্হস্থাশ্রমে নিজ কর্তব্য পালন করতে করতে মানুষ যখন বার্ধক্যের দশায় উপনীত হয় ,তখন গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করতেন। তারপর বাণপ্রস্থাশ্রমে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর সর্বস্ব ত্যাগের বাসনা উদিত হয়। বাণপ্রস্থাশ্রমের স্বধর্ম হল - ব্রহ্মচর্য ব্রতপালন, ভূমিতে শয়ন,জটাজিন ধারণ ,অগ্নিতে আহুতি প্রদান, ত্রিকাল স্নান, অতিথি সেবা এবং বন্য ফলাদি আহার প্রভৃতি।

সন্ন্যাস – চতুরাশ্রমের অন্তিমে সন্ন্যাস বা পরিব্রাজকের আশ্রমে অবলম্বনকারী ব্যক্তি সন্ন্যাসী। বাণপ্রস্থাশ্রমে কালাতিপাত করার পর আয়ুর চতুর্থাংশে সর্বসংগত্যাগ করে ব্যক্তি প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এদের স্বধর্ম হল - ইন্দ্রিয় সংযম ,সকাম কর্ম ত্যাগ, কোন বস্তুতে স্বত্ত্ব না রাখা , সর্বসাধারণের পরিহার, জীবিকা নির্বাহের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অরণ্যে বাস, দৈহিক বাহ্যাভ্যন্তরীণ শুদ্ধিকরণ ইত্যাদি।

ধর্ম যেহেতু মনুষ্যসম্প্রদায়ের একটি চিরন্তন ও সার্বজনীন বিষয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই ধর্মের মাধ্যমেই বিশ্বে মহান ব্যক্তিরা নির্মাণ করেন তাদের চিরন্তন অবদান , যা সমগ্র বিশ্বকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ভবভূতির সময়ে হিন্দু ধর্ম ছাড়াও বৌদ্ধ ধর্মও প্রচলিত ছিল আর সেই ধর্মের

সন্ন্যাসীরা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। কামন্দকি ও বৃদ্ধরক্ষিতা বৌদ্ধ ধর্মে অনুরাগিণী ছিলেন। হিন্দুদের গৃহে তারা স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারতেন ।

তন্ত্রে উচাটন, মারণ, বিদ্বেষ্ণ, স্তম্ভন্ ,আকর্ষণ ও বশীকরণ - এই ছয়টি প্রক্রিয়াকে আভিচারিক ষট্‌কর্ম বলে। এগুলো ব্ল্যাক ম্যাজিক বা কালাজাদু । স্বাভাবিক উপায়ে যখন কার্যসিদ্ধি হয় না তখন নিজের ইষ্ট ও অপরের অনিষ্ট সাধনে অতিপ্রাকৃতের সাহায্য গ্রহণ মানুষের আদিম অভ্যাস। এই অতিপ্রাকৃত প্রক্রিয়ায় কার্যসাধনের উপায় হিসেবে ষটকর্মের অবতারণা। যোগিনীতন্ত্র মতে ষটকর্ম হল -- শান্তি ,বিষয় ,স্তম্ভন, বিদ্বেষণ , উচাটন ও মারণ , রোগ, কৃত্যা এবং গ্রহদোষ নিবারণের প্রক্রিয়া হল শান্তি কর্ম বা স্বস্তয়ন। মানুষকে নিজের আদেশানুসারে বসে আনয়ন পদ্ধতি হল বিষয় বা বশীকরণ। সৈন্য প্রতিবাদীর বাক্য, বাতাস , জল প্রভৃতির প্রবৃত্তি রোধকে বলা হয় স্তম্ভন। সম্প্রীতি যুক্ত মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ঘটানোর প্রক্রিয়াকে বিদ্বেষণ বলে। প্রতিপক্ষকে ঘর ছাড়া, গ্রাম ছাড়া, নগর ছাড়া করার উপায়কে উচাটন বলে। এছাড়া প্রাণীদের প্রাণ নাশ প্রক্রিয়া হল মারণ। অতএব শান্তি ব্যতীত অবশিষ্ট পঞ্চ প্রক্রিয়াকে বলা হয় আভিচার। মালতীমাধবেও এই অভিচার প্রক্রিয়া বা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রসঙ্গ তৎকালীন সমাজে ছিল। সেই সমাজে কাপালিকের স্থান বিশেষ প্রাধান্যযুক্ত ছিল। অঘোরসম্প্রদায় গোষ্ঠীর কাপালিকের আভিচারিক ক্রিয়ার দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি সম্পন্ন করত এবং গোপন ভাবে নরবলি ও দিত। অঘোরঘন্ট ও কপালকুণ্ডলা হল এর দ্যোতক। এদের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা ছিল যে ,তারা অলৌকিক শক্তির দ্বারা কার্য সম্পাদন করতেন। এরা সুযোগ বুঝে কাউকে না কাউকে তুলে নিয়ে নিজেদের গোপনস্থানে নিতে যেত। কপালকুণ্ডলা মালতীকে করালা মন্দিরে বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে গিয়েছিল। তবে অভিচারিকদের মোক্ষম স্থান ছিল শ্মশানের নিকট নির্জন স্থান ।তবে সন্ন্যাসীরাও এই ধরণের অলৌকিক শক্তি লাভ করতেন। সৌদামিনীর শক্তিও কোন কাপালিকের তুলনায় ন্যূন নয়।

আভিচারিক ক্রিয়াকলাপ ছাড়াও সম্পূর্ণ পৃথক রূপে বৈদিক পরম্পরাও অক্ষুন্ন ছিল। কর্মকান্ডের প্রচলন, বেদ বেদাঙ্গের অধ্যয়ন হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ভবভূতির সময়ে মহিলাদের মর্যাদা ও খুব সম্মানজনক ছিল। সজ্জন বংশের মহিলারা দূর দূরান্তে শিক্ষালাভের জন্য গমন করতেন। কামন্দকী ও ভূরিবসুর সহপাঠী ছিলেন এটাই প্রমান দেয়। সঙ্গীতবিদ্যা ললিতকলা চিত্রকলাতেও তারা দক্ষ ছিল। সার্বিক দৃষ্টিতে বলা যায় ভবভূতির মহিলাদের প্রতি ধারণা খুবই সহানুভূতিশীল ছিল।

প্রাচীন ভারতের বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম অংগ উৎসব। আর উৎসব প্রিয় বাঙালির প্রাণের উৎসব বসন্ত উৎসব। ভবভূতিকালীন সমাজেও সুবসন্তক ও মদনোত্সব একটি জনপ্রিয় উৎসব। কারণ সংস্কৃত সাহিত্যে বসন্ত ঋতুর একটি বিশেষ মর্যাদা আছে । যে কোন কাব্য নাটক ও আখ্যায়িকার মধ্যে বসন্ত উৎসবের কথা উল্লেখ থাকে। যদিও কালিদাসের মেঘদূতে বর্ষার বর্ণনার কথা থাকলেও বসন্তের বর্ণনায় ঋদ্ধ। মালতীমাধবে মদনোত্সবের প্রাণবন্ত বর্ণনার আমাদের অনুভূত করে। মদন বা কামদেব প্রেম ও কামের দেবতা ,ব্রহ্মার মন থেকে যার সৃষ্টি, তিনি সুন্দর আকর্ষণীয় পুরুষ। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে যজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করেন। পরজন্মে সতী পার্বতীরূপে জন্মলাভ করে মহাদেবকে পতিরূপে পাওয়ার বাসনায় কঠোর ধ্যানে নিমগ্না হন। অপরদিকে মহাদেব তো সর্বদাই ধ্যানে মগ্ন। এদিকে দেবতাদের অনুরোধে মদন মহাদেবকে পঞ্চশরে মহাদেবের তৃতীয় নেত্রের তীব্র দহনে ভস্মীভূত হন। পরে পার্বতীর বিবাহের পর মদন পূর্বদেহ ফিরে পায়। কামদেবের পূজা হয়, তাই সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় কামের প্রয়োজন। সৃষ্টি রচনার অনুকূল কামকেই শিব এবং বিষ্ণুর সাত রূপ বলা হয়। তাই মন্দিরে কামদেবের যে আরাধনার রীতি প্রচলিত, মালতীমাধবে অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা মালতীও কামদেবের পূজা করতেন। তৎকালীন সময়ে লোকেরা কিছু ঋতু উৎসব বা সিজেনেবল ফেস্টিভ্যাল এবং অ্যানুয়াল ফেস্টিভ্যাল বা বার্ষিক অনুষ্ঠান উপভোগ করত।যা ততকালীন সময়ের সংস্কৃতির উপর আলোকপাত করে। মালতীমাধবে মদনোৎসব চৈত্রমাসের ত্রয়োদশ তিথিতে উৎযাপন হত। এই উৎসবে মালতী ও মাধব পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলিত হয়। এছাড়া বার্ষিক উৎসব বা ঋতু উত্সব

উপলক্ষে বড় বড় মেলার প্রদর্শন ছিল। সেই মেলায় জনগণেরা একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেত। অনেক বড় বড় মেলার বিশেষ আকর্ষণ হল কালপ্রিয়নাথের উৎসব। প্রলয়কালে সকল প্রাণীকে যিনি সংহার করেন ,তাকে বলা হয় কাল। **'কলয়তি সর্বভূতানি সংহরতীতি কালঃ**'। 'কাল' শব্দ বলতে রুদ্রকে বোঝানো হয়েছে। মহাদেব রুদ্র রূপে সমস্ত কিছুকে বিনাশ করেন। বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণে বলা হয়েছে - **'কলনাত্ সর্বভূতানাম্ কালঃ পরিকীর্তিতঃ**' । অপরদিকে মহাদেবই শিবরূপে সকলের মঙ্গল বিধান করেন বলে তিনি সর্বপ্রিয়। **'শিবরূপেণ মঙ্গলকরণাত্ সর্বাণ্ প্রীণাতি ইতি প্রিয়ঃ"**। আর 'নাথ' শব্দের অর্থ সর্বেশ্বর। অতএব যিনি কাল ,তিনিই শিব , এবং তিনিই নাথ। **'কালশ্চাসৌ শিবশ্চেতি নাথশ্চাসৌ**'। (ত্রিপদী কর্মধারয় সমাসসিদ্ধ) ভবভূতির তিনটি রূপকই কালপ্রিয়নাথের অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ করা হয়। উজ্জয়িনীর মহাকাল নামক প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গের নামান্তর বলে কেউ কেউ মনে করেন। আবার কারও মতে কবির জন্মস্থান বিদর্ভ দেশের পদ্মপুরের শিবলিঙ্গ বিশেষকে কালপ্রিয়নাথ বলা হয়েছে। **'কালপ্রিয়নাথঃ'** এর পাঠান্তরে বলা যায় যে **'কালস্য প্রিয়া পার্বতী তস্যাঃ নাথঃ** অর্থাৎ পার্বতী পতি শিব। সুতরাং এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে মেলা হত , তাতে নৃত্য , রঙ্গ তামাশা প্রভৃতি চলত একে অপরের মধ্যে।

ভবভূতির যুগ ছিল রাজতন্ত্রের যুগ। তৎকালীন সময়ে সামন্তপ্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ছোট ছোট রাজ্যগুলি এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। রাজা দুর্বল হওয়ার কারণে অমাত্যের প্রাধান্য ছিল বেশি । নন্দন ছিলেন এইরূপ একজন প্রভাবশালী অমাত্য।

ভারতীয় সভ্যতার গোড়ার দিকে বিবাহব্যবস্থা সমাজের উন্নতিতে বড় অবদান রাখে। বিবাহ হল বিশ্বের সকল মানব সমাজের একটি সার্বজনীন সামাজিক অনুষ্ঠান। তখন বিবাহকে ধর্মীয় রীতি হিসেবে ধরা হত। এমন এক ধরণের সামাজিক অবস্থা বা ব্যবস্থা, যেখানে শরীর ও মন একত্রিত হয় দুটি বিপরীত লিঙ্গের দ্বারা। প্রসঙ্গত ব্রিল মহোদয় দাবি করেন যে, একজন পুরুষ তখনই পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়, যখন সে তার স্ত্রীকে সুরক্ষিত করতে পারে। এটাই প্রমান করে যে , বিবাহ প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ন ফ্যাক্টর। এটি একটি স্থিতিশীল সম্পর্ক, যেখানে একজন পুরুষ ও একজন নারী সামাজিকভাবে যৌন অধিকারকে বোঝানোর জন্য সন্তান ধারণের অনুমতি প্রাপ্ত সম্পর্ক তৈরি করে। ভগবান মনু আটপ্রকার বিবাহ স্বীকার করেছেন। ব্রাহ্ম, দিব্য, আসুর, প্রাজাপত্য, সূরা, গান্ধর্ব্য, রাক্ষস, পিশাচ। এছাড়া আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতেও আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। সুতরাং এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে , বিবাহের এই সমস্ত ধরণ বা নিয়মবিধি প্রাচীন ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল। এবং প্রতি ধরণের বিবাহের জন্য পৃথক পৃথক নিয়ম কানুন বা বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে ভবভূতি দুই প্রকার বিবাহের কথা বলেছেন মালতীমাধবে। পোস্ট পূবার্টি লাভ ম্যারেজ এবং গন্ধর্ব বিবাহ। ভবভূতি মাধব ও মালতীর মিলনকে পোস্ট পূবার্টি বলে। অন্যদিকে মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার বিবাহকে গন্ধর্ব বিবাহ রূপে স্বীকার করেন । মালতীমাধবের ষষ্ঠ অংকে দেখি - মকরন্দ ও মদয়ন্তিকা একে অপরকে স্বামী - স্ত্রী হিসেবেই মেনে নিয়েছিলেন তাদের বাবা- মা কে না জানিয়েই। হিন্দু বিবাহে বিভিন্ন রীতি নীতি আছে, যেমন - বিবাহের সময় ফুলের মালা দেওয়ার প্রথা ছিল। মালতীমাধবের ষষ্ঠ অংকে আমরা দেখি মালতী একটি বকুলমালা মাধবের গলায় পরিয়ে দিয়েছেন।

বিবাহব্যবস্থার আর একটি রীতি হল - পিতা - মাতা নববধূকে পরামর্শ দেন কিভাবে একে অপরের ভালোবাসা অক্ষুন্ন রাখতে হবে। মালতীমাধবের ষষ্ঠ অংকে কামন্দকী বলেছেন -

परिणतिरामणीया: याः प्रीतयस्त्वद्विधाना

महमपि तव मान्या हेतुभिस्तैश्च तैश्च ।

तदिह सुवदनायां तात मत्तः परस्मात्

परिचयकरुणायाः सर्बथा मा विरंसीः।। (मा मा ६ /१६)

অর্থাৎ মাধব, (তোমার মত) পুরুষের প্রেম পরিণামে রমণীয় হয়ে থাকে। আমিও (কামন্দকী) নানা কারণে তোমার শ্রদ্ধার পাত্র । তাই হে পুত্র, আমি যখন থাকব না তখনও এই সুবদনার (মালতী) প্রতি প্রেমানুগ্রহ থেকে বিরত হয়ো না।

স্বামী- স্ত্রীর সম্পর্কের বিষয়ে ভবভূতির দৃষ্টিভঙ্গি খুবই আদর্শ ছিল। বিবাহের পর স্বামী স্ত্রী একে অপরকে সমস্ত বিষয়ে বিবেচনা করাই শ্রেয়। ষষ্ঠ অংকে ভবভূতি বর্ণনা করেছেন - স্বামী - স্ত্রীর এক মন নিয়ে কাজ করা উচিত। তাদের একে অপরের সুখ দুঃখের ভাগীদার হওয়া উচিত।তাই ষষ্ঠ অংকে কামন্দকী বলেছেন –

प्रेयो मित्रं वन्धुता वा समग्रा

सर्वे कामाः शेवधिजीवितं वा ।

स्त्रीणां भर्ता धर्मदाराश्च पुंसा

मित्यन्योनां वत्सयोज्ञातमस्तु।। (मा मा ६ / १८)

অতএব বিবাহ হল একটি সমস্ত মানবসভ্যতার কাছে চিরন্তন সার্বজনীন সামাজিক বন্ধন।

ভবভূতির সময়ে বিরাজমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিফলন মালতীমাধবে প্রতিফলিত হয়েছে । মধ্যভারতের পদ্মাবতী নগরী ছিল শিক্ষার অন্যতম পীঠস্থান। বিদর্ভের মত দূরদেশে মাধব ও তার বন্ধুকে (মকরন্দকে) পাঠানো হয়েছিল। পুরুষ ও মহিলারা এক সাথেই আশ্রম ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত। মালতীমাধবে পাই কামন্দকী, সৌদামিনী, দেবরাত, ভূরিবসু পদ্মাবতীর বিশ্ববিদ্যালয়ে একসাথে অধ্যয়ন করেছেন।

ভবভূতির সময়ে সঙ্গীত নৃত্য অভিনয় - এগুলি শিক্ষার অঙ্গ ছিল মালতীমাধবের দ্বিতীয় অংকে ভূরিবসুর সঙ্গীতশালার উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে গান ,সংগীত ও নৃত্যের শিক্ষা দেওয়া হত। অন্যদিকে দশম অংকে কেবল মাধবের ভৃত্য কলহ্ংস নয়, বৌদ্ধ মহিলা শিষ্যা অবলোকিতা এবং বুদ্ধরক্ষিতার নৃত্য পরিবেশিত হয়েছে। মালতী মাধবের ভূমিকা তে আমরা দেখি পুরুষ অভিনেতা নাটকে মহিলা অভিনেত্রীর ভূমিকা পালন করেছেন। এইভাবে আমরা দেখতে পাই , ভবভূতির সময়ে সঙ্গীত নৃত্য অভিনয় শিক্ষার প্রসার ছিল। তৎকালীন সমাজের মানুষ আরামদায়ক জীবন যাপন করত। তাই ভবভূতির মালতীমাধব একটি তথ্যের ভান্ডার, কারণ তৎকালীন সমাজের একটি উজ্জ্বল ছবি হল ‘মালতীমাধব’।

গ্রন্থপঞ্জি -

১। কালে, এম, আর – 'মালতীমাধব', মোতিলাল বারাণসী দাস পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লি, ৩য় সংস্করণ ১৯৬৭

২। ত্রিপাঠি, রমাকান্ত – 'উত্তররামচরিত', চৌখাম্বা সুরভারতী' প্রকাশন, বারাণসী, ২০১২

৩। দাস, গুরুচরণ – 'ভবভূতির কাব্যে মানুষ ও প্রকৃতি', সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০২

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু – 'মনুসংহিতা', স্বদেশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪১২

৫। বিদ্যাভূষণ, রাজেন্দ্রনাথ – 'শ্রীকন্ঠ ভবভূতি, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা , ২০১১

৬। ভট্টাচার্য, শ্যামাপদ - 'উত্তররামচরিত', সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা ২০০৭

৭। ভট্টাচার্য, হেমন্ত – 'কালিদাস ও ভবভূতির সাহিত্যে নারী চরিত্র', সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা , ২০০৩

৮। শাস্ত্রী, গৌরীনাথ- 'সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার', নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪

৯। শাস্ত্রী, শেষরাজ – 'মালতীমাধব', চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারাণসী', ২০০৫